ইরাকের টাকায় বুশের যুদ্ধ

৯৫০০ কোটি ডলার মূল্যের ইরাক যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই খরচ আরো বাড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্র তাই চায়। এর পেছনের রহস্য খুবই পরিস্কার। বিপুল তেলসমৃদ্ধ ইরাকের তেল বিক্রি করে উঠে আসবে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ খরচ। মাছের তেলে মাছ ভাজার কাজটি করার জন্য যুদ্ধে নেমেছেন বুশ-ব্লেয়ার জুটি...

লিখেছেন - **হাসান মূর্তাজা**

মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ল্যারি লিন্ডসে বলেছেন, 'যুদ্ধের সফল সমাপ্তি আমাদের অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে।' ইরাকে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন ডয়েচ ব্যাংক সিকিউরিটিজের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ পিটার হুপার। তার মতে, 'আমরা যদি ইরাকি তেল স্থাপনাগুলোর কোনো রকম ক্ষতি ছাড়াই সেগুলো অধিকার

করতে পারি এবং কোনো ধরনের সন্ত্রাসী হামলা ব্যতিরেকেই তুলনামূলকভাবে দ্রুততার সঙ্গে সামরিক ক্ষেত্রে বিজয়ী হই, তবে তা অর্থনীতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।' এসব বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার তা হলো, যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধকে এক লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে দেখছে। বাগদাদে এখন প্রতিদিন ১০ লাখ ডলার মূল্যের হাজার হাজার ক্রুজ মিসাইল পড়ছে। প্রতিটি ১ লাখ ডলারের লেজার গাইডেড বোমা ফেলা হচ্ছে বিমান থেকে। ট্যাংক থেকে ছোঁড়া হচ্ছে প্রতিটি ৩ লাখ ডলারের বোমা। প্রতিদিনের যুদ্ধ ব্যয় ৩ থেকে ৪ বিলিয়ন ডলার। এসব 'বোমা বিনিয়োগের' মুনাফা প্রেসিডেন্ট বুশ তুলবেন ইরাকের তেল বিক্রি করে। জাতিসংঘের তহবিলে ইরাকের তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ৪০০০ কোটি ডলার আটকে আছে। ইরাকি তেলের কেবলমাত্র এই তহবিল হস্তগত করতে পারলেই যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধখরচের অর্ধেকই উঠে আসবে এক মুহূর্তে।

যুদ্ধ মানেই বিপুল ব্যয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো এই ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবেই দেখে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র বেছে বেছে সেইসব যুদ্ধেই জড়ায়, যেখানে তার আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ধরা যায়। প্রথমদিকে এই যুদ্ধ কেবল ইউরোপের ভূখন্ডে সীমাবদ্ধ ছিলো। যদিও পরের দিকে তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানে এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আমেরিকা বরাবরই যুদ্ধের বাইরে ছিলো। এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা দেন, যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে জড়াবে না। এরপর সবাই জানে, জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে হামলা চালায়। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা। এ ক্ষেত্রে জাপানকে আক্রমণ চালাতে মার্কিন উসকানির বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। মূলত জাপানে তেল ও ইস্পাত সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করে। এই উৎসাহদানের পেছনে ছিলো মার্কিন ব্যবসায়িক বুদ্ধি। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বুঝেছিলো, যুদ্ধে লিপ্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও অর্থ প্রয়োজন। কোনো মতে যুদ্ধে জড়াতে পারলে এসব দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে সে সময় চলমান অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে। বস্তুত হয়েছিলোও তাই। তাই বলা যায়, যুদ্ধ মার্কিনিদের জন্য লাভজনক ব্যবসা।

এবারের ইরাক যুদ্ধও ব্যবসার বাইরে নয়। বিশেষত প্রতিরক্ষা শিল্পের মতো বৃহৎ শিল্পের জন্য এটি একটি অসাধারণ সুযোগ।

যুক্তরাষ্ট্র চায় কোন রকম ক্ষতি না করেই ইরাকী তেলক্ষেত্রগুলোয় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

যুক্তরাষ্ট্র কোন যুদ্ধে কতো ব্যয় করেছে

যুদ্ধ	ব্যয় (কোটি ডলার)
বিপ্লব যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮৩)	২২০
১৮১২ সালের যুদ্ধ (১৮১২-১৮১৫)	১১০
মেক্সিকো যুদ্ধ (১৮৪৬-১৮৪৮)	১৬০
গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫)	৬২০০
স্পেন-মার্কিন যুদ্ধ (১৮৯৮)	৯৬০
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৭-১৮)	১৯০৬০
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪১-৪৫)	২,৮৯,৬৩০
কোরিয়া যুদ্ধ (১৯৫০-৫৩)	৩৩৫৯০
ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬৪-৭২)	৪৯৪৩০
১ম উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০-৯১)	৭৬১০

৫০০ মার্কিন কংগ্রেসীয় এলাকার প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রতিরক্ষা শিল্প কারখানা রয়েছে। এদের আয়ের একটা বৃহৎ অংশ যায় মার্কিন নেতাদের পকেটে। তাই প্রতিরক্ষা শিল্প সংশ্লিষ্ট সবাই চায় যুদ্ধ। এদের চাপ উপেক্ষা করা কংগ্রেসম্যানদের জন্য সহজ নয়। বিশেষত সমরাস্ত্র লবি কংগ্রেস সদস্যদের একটা বড় অংশের নির্বাচনী ব্যয় যোগায়। এই অস্ত্র লবিই রিপাবলিকান দলের মূল চালিকা শক্তি। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের মূল উদ্যোক্তও ছিলো এরাই। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে লিপ্ত হলে সমরাস্ত্র শিল্পের লাভ দুই দিক থেকে। প্রথমত, এসব অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি করে মোটা অর্থ আয় করে। বিশেষত সরকারই এসব শিল্পের মূল ক্রেতা। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী অস্ত্র ক্রয়ের হিড়িক পড়ে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো জোট বাহিনীর বিভিন্ন অস্ত্রের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। যেমন-

শীর্ষ সামরিক ব্যয়ের দেশ

১। যুক্তরাষ্ট্র	৮। জার্মানি
২। ন্যাটো ইউরোপ	৯। ইটালি
৩। রাশিয়া	১০। সৌদি আরব
৪। জাপান	১১। ব্রাজিল
৫। চীন	১২। তাইওয়ান
৬। ফ্রান্স	১৩। ভারত
৭। ব্রিটেন	

টোমাহক ক্রুজ মিসাইল এখন কতো নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম ইত্যাদি ইত্যাদি। '৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে এসব মিসাইল ছিলো লেজার গাইডেড। এখন অধিকাংশই স্যাটেলাইট গাইডেড। ফলে এসব মিসাইলের সঠিক লক্ষ্যে আঘাত হানার ক্ষমতা বেড়েছে ৯০ শতাংশ। একইভাবে পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমে আব্রামস মেইনব্যাটল ট্যাংক, অ্যাপাচি হেলিকপ্টার, বি-৫২ এবং হর্নেট বিমানগুলোর কর্মদক্ষতার ব্যাপক প্রচার চলছে। এগুলো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞাপন। প্রচারেই প্রসার। এসব অস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতা সম্পর্কে যত প্রচার করা হবে, ততোই এগুলোর পরিচিতি এবং বিক্রি বাড়বে। এ কারণে যুদ্ধের পর অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো লাভের মুখ দেখে।

কিন্তু সরকারের লাভ অন্যত্র। সরকার অস্ত্র কিনতে ব্যয় করে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে দেশে বিনিয়োগ হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে এবং অর্থনীতি সবল হয়। অন্যদিকে, অস্ত্র বিক্রির কমিশনও পায় সরকার। কিন্তু সকারের লাভ আরো এক জায়গায়। একটি যুদ্ধ জয় মানেই সে দেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ বিজিত দেশের সম্পদের ওপর কব্জা। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর পুরো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আমেরিকা সামরিক ঘাঁটি করতে

পেরেছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বেড়েছে। তাছাড়া মার্কিন অস্ত্র বিক্রির লাভ তো আছেই। এক হিসাব মতে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র ৫০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছিলো। যার প্রধান ক্রেতা ছিলো সৌদি আরব, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এ বছরের ইরাক যুদ্ধেও ঠিক তাই হতে যাচ্ছে।

শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক (১৯৯৬-২০০০)	শীর্ষ অস্ত্র রপ্তানিকারক
১। তাইওয়ান	১। যুক্তরাষ্ট্র
২। সৌদি আরব	২। ব্রিটেন
৩। তুরস্ক	৩। রাশিয়া
৪। দক্ষিণ কোরিয়া	৪। ফ্রান্স
৫। চীন	৫। জার্মানি
৬। ভরত	৬। সুইডেন
৭। গ্রিস	৭। চীন
৮। জাপান	৮। ইউক্রেন
৯। মিশর	৯। ইটালি
১০। ফিনল্যান্ড	১০। ইসরায়েল
১১। পাকিস্তান	১১। বেলারুশ

যুদ্ধের লাভ, লাভের যুদ্ধ

ইরাক যুদ্ধের জন্য বুশ প্রশাসন কংগ্রেসের কাছে ৯৫০০ কোটি ডলার বাজেট পেশ করেছে। কংগ্রেস বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই বাজেট অনুমোদন করেছে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন দারুণ মন্দা। বেকারত্ব বেড়েছে। মার্কিন ডলার ইউরোর বিপরীতে দুর্বল। ৯০ দশকের ফেঁপে ওঠা তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প চুপসে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রেসিডেন্ট বুশ ৭২ হাজার কোটি ডলার কর মওকুফের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কারণে সেই কর হ্রাসের পরিকল্পনায় বড়সড় কাটছাঁট করার ঘোষণা দিয়েছে বুশ প্রশাসন। উপরন্তু মার্কিন অর্থনীতির এই পতন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে অতি সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী পল ও'নিল এবং প্রেসিডেন্ট বুশের একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। এই যখন অর্থনীতির অবস্থা, তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহু দূরে বিপুল ব্যয়ের একটা যুদ্ধ চালানোর কি যুক্তি?

৯৫০০ কোটি ডলারের যুদ্ধবাজেট পেশ করলেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধ ব্যয় বাজেট ছাড়িয়ে যাবে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল এডম্যান বলেন, এই বাজেটের পরিমাণ বিশ্বাস করা যায় না। যুদ্ধ শেষে দেখা যাবে যুদ্ধ ব্যয় কয়েকশ হাজার কোটি ছাড়িয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্র এর আগে যতগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধ ব্যয় বাজেট ছাড়িয়েছে। ১৯৬৬ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় কংগ্রেস যে বাজেট পাস করেছিলো, ৭ বছর পর দেখা যায় মোট ব্যয় প্রাথমিক বাজেটের ৯০ শতাংশেরও বেশি। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যয় হয়েছিলো ১১,১০০ কোটি ডলার। এবার তিন মাস ধরে মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতিতে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া, প্রতি মাসে কুয়েতে সৈন্যদের পেছনে ব্যয় হবে ১ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে শুধু অভিযান চালাতেই ব্যয় হবে ১ থেকে ১.৫ বিলিয়ন ডলার। যুদ্ধের দৈনন্দিন খরচও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত প্রায় হাজার দুয়েক টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এসব প্রতিটি মিসাইলের দাম ১০ লাখ ডলার। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করছে, তারা এবার বিমান থেকে স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত বোমা নিক্ষেপ করছে। এসব প্রতিটি বোমার খরচ ২১ হাজার ডলার। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ৮৬ হাজার বোমা নিক্ষেপ করেছিলো। এবার কয়েকগুণ বেশি বোমা

বাংলাদেশ থেকে বেলজিয়াম; সর্বত্র চলছে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ। কিন্তু বুশ-ব্লেয়ার জুটির টনক তাতে নড়ছে না

শীর্ষ তেল ব্যবহারকারী দেশ (২০০১)

দেশ	ব্যবহারের পরিমাণ (দৈনিক লক্ষ ব্যারেল)
১। যুক্তরাষ্ট্র	১৯৭
২। জাপান	৫৪
৩। চীন	৪৯
৪। জার্মানি	২৮
৫। রাশিয়া	২৫
৬। ব্রাজিল	২২
৭। দক্ষিণ কোরিয়া	২১
৮। ফ্রান্স	২০
৯। কানাডা	২০
১০। ভারত	২০

নিক্ষিপ্ত হবে। বাংকার ধ্বংসের জন্য নিক্ষেপ করা হচ্ছে 'বাংকার বুস্টার' বোমা যার প্রতিটির দাম দেড় লাখ থেকে তিন লাখ ডলার। এ ছাড়া যুদ্ধবিমান দিয়ে বোমাবর্ষণে প্রতি ঘন্টায় প্রতিটি বিমানের খরচ ১০-১৫ হাজার ডলার। এবার কেবল যুক্তরাষ্ট্রই ব্যবহার করবে প্রায় ৮৫০টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। সৌদি আরব ও তুরস্কের বিমানঘাঁটি ব্যবহার না করতে পারায় এসব যুদ্ধবিমানের খরচ আরো অনেক বেড়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগারে এ পর্যন্ত ৫টি নিমিৎস ক্লাস রণতরী ব্যবহার করছে। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুশক্তি চালিত এসব একেকটি রণতরীর পেছনে মাসে ব্যয় হয় ৩০ লাখ ডলার। যুদ্ধে এই খরচ আরো বাড়ে। এসব যুদ্ধ খরচের সঙ্গে যোগ হবে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব। যেমন- যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে অর্ধ বিলিয়ন ডলারের দুটি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার হারিয়েছে। উপরন্তু, মাথাপিছু ৭ ডলার হিসেবে আড়াই লাখ সৈন্যের দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে। সব মিলিয়ে যুদ্ধে কতো ব্যয় হচ্ছে তা আন্দাজ করা খুবই মুশকিল। অর্থনীতিবিদ পল হিসাব কষে দেখিয়েছেন, মার্কিন যুদ্ধ ব্যয় বাজেট ছাড়িয়ে কমপক্ষে ১০০ বিলিয়ন ডলার দাঁড়াতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক মার্কিনির মাথাপিছু যুদ্ধ খরচ দাঁড়াবে ৩৭৫ ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, যুদ্ধের এই বিপুল ব্যয় বহন করবে কে? মার্কিন করদাতারা, নাকি অন্য কেউ?

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের ব্যয় ছিলো সাড়ে ৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। যুদ্ধ ব্যয়ের ৮০ শতাংশই বহন করেছিলো মিত্র দেশ- সৌদি আরব, কুয়েত, জার্মানি, জাপান এবং অন্য কয়েকটি দেশ। পরবর্তীতে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় ইরাকের তেল বিক্রি করে আরো বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র। অস্ত্র বিক্রির অর্থ ছাড়াও যুদ্ধের ব্যয় এভাবে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দারুণভাবে লাভবান হয়েছিলো আমেরিকা। কিন্তু এবার উপসাগরীয় যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি

'তেলের জন্য যুদ্ধ নয়' : সারা বিশ্ব জানে এই যুদ্ধ তেলের কারণে

শীর্ষ তেল আমদানিকারক দেশ (২০০১)

দেশ	পরিমাণ (দৈনিক লক্ষ ব্যারেল)
১। যুক্তরাষ্ট্র	১০৮
২। জাপান	৫৪
৩। জার্মানি	২৭
৪। দক্ষিণ কোরিয়া	২১
৫। ফ্রান্স	২০
৬। ইটালি	১৭
৭। চীন	১৬
৮। স্পেন	১৫
৯। ভারত	১৩

শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশ (২০০১)

দেশ	পরিমাণ (দৈনিক লক্ষ ব্যারেল)
১। সৌদি আরব	৭৩.৮
২। রাশিয়া	৪৭.৬
৩। নরওয়ে	৩২.২
৪। ইরান	২৭.৪
৫। ভেনিজুয়েলা	২৬
৬। সংযুক্ত আরব আমিরাত	২০.৯
৭। ইরাক	২০
৮। নাইজেরিয়া	২০
৯। কুয়েত	১৮
১০। মেক্সিকো	১৬.৫

হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আগের মিত্র দেশগুলো এবার প্রচন্ডভাবে যুদ্ধবিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর কৌশলবিদদের হিসাবে এ ব্যাপারটি আছে। আর তাই এবার যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য তাকিয়ে আছে ইরাকের তেলের দিকে। ব্যাপারটি অদ্ভুত শোনালেও সত্য। যুদ্ধ হচ্ছে ইরাকের বিরুদ্ধে এবং এই যুদ্ধের খরচ মেটাবে ইরাক।

যুদ্ধের শুরুতেই মার্কিন রণকৌশলের মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো দখলে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে জোটবাহিনীর সেনারা। উদ্দেশ্য একটাই, যেন তেলের কোনো ক্ষতি না হয়। কুয়েত থেকে যুদ্ধের প্রথম দিনই ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জোট বাহিনীর সাঁজোয়া বহর। দক্ষিণ ইরাকের তেলসমৃদ্ধ বসরা নগরী দখলই তাদের লক্ষ্য। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জোটবাহিনী ঘোষণা দেয়, তারা সমস্ত তেল ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে দক্ষিণের ছোট্ট বন্দরনগরী উমকসর নিয়ে ব্যাপক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উমকসরের সামরিক গুরুত্ব না থাকলেও পশ্চিমা

বিশ্বের তেল রিজার্ভ ও উৎপাদন

দেশ	প্রমাণিত রিজার্ভ (বিলিয়ন ব্যারেল)	বর্তমান দৈনিক উৎপাদন (লাখ ব্যারেল)
সৌদি আরব	২৫৯ (২৪%)	৭৯
ইরাক	১১৩ (১১%)	২৮
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯৮ (৯%)	২১
কুয়েত	৯৪ (৯%)	১৯
ইরান	৯০ (৯%)	৩৭
ভেনিজুয়েলা	৭৩ (৭%)	২৭
মেক্সিকো	৪৮ (৫%)	২৮
রাশিয়া	৪৮ (৫%)	৬০
যুক্তরাষ্ট্র	২৩ (২%)	৬

জোটের তেলসম্পদ করায়ত্ত করার জন্য এই ছোট শহর গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই বন্দর দিয়েই ইরাকের তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত হয়। উমকসর বন্দরে প্রবেশ করেই মার্কিন বাহিনী ঘোষণা দেয়, তারা তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি শীঘ্রই চালু করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে তেলের উত্তোলন ও বিক্রি কে করবে? এ মুহূর্তে জাতিসংঘ এই কর্মসূচি স্থগিত করেছে। যুদ্ধ শুরুর আগে মার্কিন প্রশাসন সাদ্দাম হোসনকে

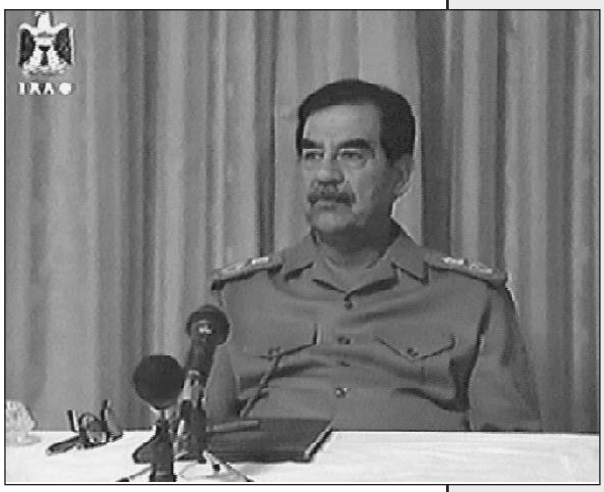

হুমকি দিয়েছিলো যেন ইরাকের তেলকূপগুলোতে আগুন না লাগানো হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ তার টেলিভিশন ঘোষণায় ইরাকি জনগণের উদ্দেশে বলেছিলেন, তেল ইরাকি জনগণের সম্পদ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই তেল দখলের কোনো উদ্দেশ্য নেই। উদ্দেশ্য আছে কি নেই মার্কিন সামরিক কৌশলের দিকে নজর দিলেই তা পরিষ্কার। এখন পর্যন্ত ইরাকের উত্তরে যৌথ স্থলবাহিনী প্রবেশ না করলেও যুক্তরাষ্ট্র ১০১ এয়ারবোর্ন কমান্ডো নামিয়েছে মসুল ও কিরকুকের তেল ক্ষেত্রের আশপাশে। অন্যদিকে, ইরাক তেল ক্ষেত্রগুলোতে আগুন লাগিয়েছে এমন প্রচার

হাসপাতালে আহত শিশুর ছবি বুশ-ব্লেয়ারের মধ্যে মানবতাবোধ জাগায় না

সাদ্দামের রণকৌশল

যুদ্ধ শুরুর আগে জোট বাহিনীর কথাবার্তায় মনে হচ্ছিলো, ইরাক যুদ্ধ হবে যেন 'ভিডিও গেম' খেলা। যুদ্ধ শুরুর পর বোঝা যাচ্ছে, ইঙ্গ-মার্কিন ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে বাস্তবের তফাত কতটুকু। ইরাকি তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ সাঈদ আল সাহাফ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিলো যুদ্ধ হবে তাদের জন্য 'পিকনিক'। আমরা এখন তাদের শিক্ষা দিচ্ছি। 'আঘাত ও ভীতি' নাম দেয়া অভিযান উল্টো তাদের জন্যই ভীতি বয়ে আনছে।

'৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকি বাহিনী একটা বড় ভুল করেছিলো। দক্ষিণের বিশাল, বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে তারা ঘাঁটি গেড়েছিলো কুয়েত থেকে ধেয়ে আসা যৌথবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য। পরিণতিতে খোলা মরুতে মার্কিন বোমারু বিমানগুলোর সহজ টার্গেট পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু এবার ইরাকি বাহিনী কৌশল বদলেছে। বিভিন্ন ছোট-বড় শহরকে কেন্দ্র করে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তারা। ফলে উম্ম কসরের মতো ছোট শহর দখল করতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে জোটবাহিনীর। সবচে' ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণের আরেক শহর আন-নাসিরিয়ায়। নাসিরিয়ায় গত তিন দিন ধরে লড়াই চলছে। যুদ্ধের তৃতীয় দিন ইরাকি তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আন-নাসিরিয়ায় জোটবাহিনীকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। এই ফাঁদ থেকে একজনও জীবিত বের হতে পারবে না। বাস্তবেও তাই হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬ জন নিহত ও ৫০ জনের মতো হতাহত হয়েছে এখানে।

ইরাকি সেনাবাহিনীর প্রকৃত যুদ্ধ হবে বাগদাদ শহরকে কেন্দ্র করে। রাজধানীকে রক্ষার জন্য তৈরি হয়ে আছে ইরাকের সবচে' অভিজাত রিপাবলিকান গার্ড ও স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী। এরা চাচ্ছে মার্কিন বাহিনীকে শহরে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গেরিলাযুদ্ধে লিপ্ত হতে। ফোরাত নদী দিয়ে সুরক্ষিত বাগদাদ নগরীর প্রবেশ মুখে ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হতে পারে জোট বাহিনী।

সমর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মার্কিন বাহিনী যদি বাগদাদের রাস্তায় যুদ্ধে লিপ্ত হতে যায়, তাহলে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হবে অকল্পনীয়। ইতিমধ্যেই প্রেসিডেন্ট বুশ স্বীকার করেছেন, যা তারা ধারণা করেছিলেন, প্রতিরোধ হচ্ছে তারচেয়ে বেশি। ফলে যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। যুদ্ধ যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে বিশ্বজনমত বিশেষত মার্কিন জনগণ প্রচন্ডভাবে ক্ষেপে উঠতে পারে। দাবি উঠতে পারে যুদ্ধবিরতির। তাই সাদ্দামের লক্ষ্য, যুদ্ধ যতোটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করা।

চালিয়ে ভীতি ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ৯৫০০ কোটি ডলারের যুদ্ধব্যয় উঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের তেলকূপগুলো রক্ষায় ব্যস্ত। যদিও ভাবখানা এমন, ইরাকি জনগণের স্বার্থেই তারা এগুলো রক্ষা করছে। এ হিসাবে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরাক যুদ্ধে যা ব্যয় করবে, ইরাকি তেল বাজারে বিক্রি করে ১০-১২ বছরের মধ্যেই সেই ব্যয় উঠিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র লাভের মুখ দেখতে শুরু করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে এই তেলের দখল নেবে? এখানে রয়েছে আরেক চমৎকার কৌশল। যার নাম 'পুনর্গঠন'।

পুনর্গঠন নাকি লুটপাট

ইরাক যুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। কবে শেষ হবে কেউ জানে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই ইরাক পুনর্গঠনের তোড়জোড় শুরু করেছে। ব্যাপক বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে প্রতিদিন শতশত সাধারণ ইরাকি নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা কিংবা আহত করছে জোটবাহিনী। অথচ তারাই বলছে মানবিক সাহায্য ও পুনর্গঠনের কথা। কথায় ও কাজে বৈসাদৃশ্য থাকলেও

‘বুশ-চেনির পারিবারিক ব্যবসা’

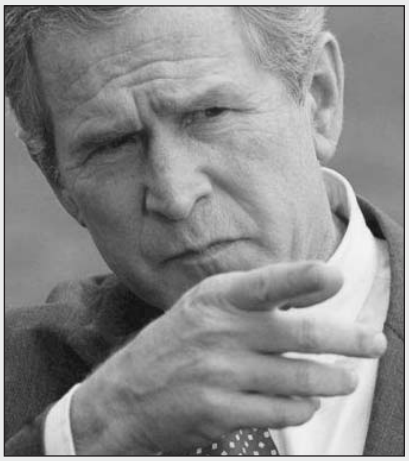

‘দি লাস্ট এনার্জি ওয়ার’ বইয়ের লেখক হার্ভে ওয়াসেরম্যান বলেছেন, ‘বুশ-চেনির দল যুক্তরাষ্ট্রকে একটি পারিবারিক ব্যবসায় পরিণত করেছেন।’ ইরাক যুদ্ধ শেষে পুনর্গঠনের নামে যে পরিকল্পিত ভাগবাটোয়ারা শুরু হবে, তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বুশ এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির কোম্পানি।

প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার ডেপুটি চেনি দু’জনেই তেল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। জাপাটা পেট্রোলিয়াম নামে জর্জ বুশের যৌথ মালিকানার একটি তেল অনুসন্ধান কোম্পানি ছিলো। বিভিন্ন কারণে এটি লোকসান দিচ্ছে বছরের পর বছর। অন্যদিকে, ২০০০ সালে নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগে পর্যন্ত ডিক চেনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম তেল-গ্যাস কোম্পানি ‘হেলিবার্টনের’ প্রধান। সেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেও এখন কোম্পানিটির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছেন ডিক চেনি। প্রতি বছর ১০ লাখ ডলার অবসর ভাতা পান তিনি এই কোম্পানি থেকে। ইরাক ‘পুনর্গঠনের’ নেতৃত্বে থাকবে এই দুই কোম্পানি।

প্রেসিডেন্ট বুশের নিজস্ব কোম্পানি জাপাটা পেট্রোলিয়াম ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে পাইপলাইন নির্মাণের কাজ পেয়েছে। অন্যদিকে ইরাকে পুনর্গঠন কাজ চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ইউএসএইড যে ৯০ বিলিয়ন ডলারের টেন্ডার পেশ করেছে, ইউএসএইড যেসব কাজ করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে তার মধ্যে আছে ‘অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও সেতু’, ১৮ মাসের মধ্যে ১৫০০ মাইল

আমেরিকা জানে, তার যুদ্ধ খরচ ওঠানোর মোক্ষম উপায় ইরাক পুনর্গঠন।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ তার সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনীতি এবং অবকাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। ইরাকের একমাত্র সম্পদ তার তেল। স্বাভাবিকভাবেই ইরাক পুনর্গঠনে তেলই হবে একমাত্র হাতিয়ার। যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগের অপেক্ষায় আছে। ইরাকের প্রমাণিত তেল মজুদের পরিমাণ ১১২ বিলিয়ন ব্যারেল। অপ্রমাণিত মজুদ ৩০০ বিলিয়ন ব্যারেল ছাড়াতে পারে। বর্তমানে ইরাকের দৈনিক উৎপাদন ২৮ লাখ ব্যারেল। এর মধ্যে ২০ লাখ ব্যারেল জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববাজারে আসে। বাকি ৮ লাখ ব্যারেল পাইপ লাইনে সরাসরি জর্ডান এবং সিরিয়ায় রপ্তানি হয়। কিন্তু ইরাকের তেল উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি। সংস্কার সাধন সম্ভব হলে ইরাক দৈনিক ১ কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদনে সক্ষম। বর্তমানে ইরাক বাৎসরিক তেল বিক্রি করে ১৫০০ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরাকি তেলক্ষেত্রগুলোতে আগামী ১০ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারলে দৈনিক ৬ কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদনে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে বিদেশী বিনিয়োগ। এখন প্রশ্ন, বিনিয়োগ করবে কে?

মার্কিন এবং ব্রিটিশ কোম্পানিসমূহ ইরাকে ‘বিনিয়োগ’ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ইরাক যুদ্ধ শুরুর আগেই ‘পুনর্গঠন’ কাজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএইড ৬০ কোটি মার্কিন

যুদ্ধবিরোধীরা অভিনব উপায়ে প্রচারণা চালাচ্ছে। এমনি এক ডলারের পিঠে লেখা ‘দি ইউনাইটেড স্টেটস অব অ্যাগ্রাসন’ -আগ্রাসী যুক্তরাষ্ট্র। বুশকে বলা হয়েছে ‘বিগ ব্রাদার’

দীর্ঘ সড়কপথ, ইরাকের হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ গ্রিডের ১৫ শতাংশের সংস্কার, কয়েক হাজার স্কুল সংস্কার, ৫৫০টি জরুরি ভিত্তিক জেনারেটর স্থাপন ইত্যাদি। এছাড়াও আছে ইরাকি তেল স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উৎপাদন বাড়ানোর কাজ। যে পাঁচটি কোম্পানি এই টেন্ডার জিতেছে তার অন্যতম চেনির 'হ্যালিবার্টন'। এছাড়া ইরাকে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যেসব তেলকূপে আগুন ধরানো হবে, সেসব আগুন নেভানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে হ্যালিবার্টনের শাখা 'ব্রাউন এন্ড রুট'কে। আগামীতে ইরাকে প্রায় ১৫০ কোটি ডলারের তেলকূপ সংস্কারের যে কাজ হবে, 'ব্রাউন এন্ড রুট'কে সেসব কাজ দেয়ারও পথ পরিষ্কার হয়েছে। তেল ছাড়াও সামরিক বাহিনীর জন্য রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগিতা যোগানোর কাজ করবে হ্যালিবার্টনের সহযোগী কেবিআর ইঞ্জিনিয়ারিং। '৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পর কুয়েতের তেলকূপগুলোতে ভারী যন্ত্রাংশ এবং প্রকৌশল সহযোগিতা দিয়েছিলো এই কোম্পানি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এবারের যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজ থেকে হ্যালিবার্টন কমসে কম ৩ বিলিয়ন ডলার লাভ করবে।

বুশ প্রশাসনের এই লুটপাটের বিষয়টি অবশ্য কারো নজর এড়াচ্ছে না। পশ্চিম ইউরোপের মার্কিন সেনাবাহিনীর মুখপাত্রকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো এ ধরনের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে যুদ্ধে জড়ানোটা ঠিক কি না। তার উত্তর : 'আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, যুদ্ধকালীন এভাবে ঠিকাদারি করে লাভ করাটা ঠিক কি না- আমি বলবো, আপনারা বরং উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করুন, যারা এসব নীতি নির্ধারণ করে।'

পেন্টাগনের একদল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইরাক পুনর্গঠন ও মার্কিন যুদ্ধ খরচ মেটানোর জন্য ইরাকে তেলসম্পদ ব্যবহারের পক্ষে ওকালতি করছে। এদের একজন নাম না প্রকাশ করে বলেছেন, 'আমরা যতক্ষণ না ইরাকে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন তেল বিক্রির অর্থ নিজেদের অধিকারে রাখব।' অনেকেই বলছেন, ইরাক যুদ্ধে তেল হবে 'গণীমতের মাল'। বিশেষত এ পর্যায়ে খাদ্যের বিনিময়ে তেল কর্মসূচির আওতায় প্রতিদিন ৮০ ভাগ তেল জাতিসংঘের তহবিলে যায়। বাকি ২০ ভাগ যার বাজার মূল্য বছরে ৩০০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, সাদ্দাম তার গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরিতে কিংবা সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় করে। মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো আশা করছে, প্রাথমিক পর্যায়ে এই ২০ ভাগ তেল তারা নিজেদের কব্জায় আনতে পারবে।

'৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধেও কথা উঠেছিলো, যুক্তরাষ্ট্র কুয়েতের তেল দখলের জন্য ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। পরে সাবেক মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল রামজে ক্লার্কের নেতৃত্বে মার্কিন নেতৃবৃন্দকে একটি তদন্ত কমিশনের সামনে হাজির করেন। তার রিপোর্টের উপসংহার ছিলো : 'আমরা বিশ্বাস করি ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো 'পুরনো সুদিন' ফিরে পাওয়া। যখন মার্কিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদ পুরোপুরি ভোগ করতো।' যুক্তরাষ্ট্রের হর্তাকর্তাদের সন্দিগ্ধ আচরণে টের পাওয়া যাচ্ছে এবারের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও একই।

ডলারের 'ভিশন ফর ইরাক' নামে এক পরিকল্পনা পেশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, এই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘের অনুমতি লাগবে না। বিদ্যুৎ, তেলক্ষেত্র উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণে ইরাকে কাজ করার জন্য ইউএসএইড টেন্ডার আহ্বান করে কিছুদিন আগে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম কোম্পানি 'কেলগ ব্রাউন এন্ড রুট' এবং লুইস বার্গার গ্রুপকে এই টেন্ডারে অংশ নিতে অনুরোধ জানিয়েছে। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ২০০০ সাল পর্যন্ত ৫ বছর 'কেলগ ব্রাউনের' মূল কোম্পানি হ্যালিবার্টনের প্রধান নির্বাহী। তিনি এখনো এই কোম্পানি থেকে বাৎসরিক ১০ লাখ ডলার পেনশন পান। এই কোম্পানিটি ২০০১ সালের ডিসেম্বর থেকে ৮৩ বিলিয়ন ডলার লাভ করেছে মার্কিন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্ট জুগিয়ে। কোম্পানিটি আফগানিস্তান, হাইতি, জিবুতিসহ বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর পক্ষে কাজ করেছে। পেন্টাগন ইতিমধ্যে যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠন কাজ তদারকির জন্য এক দপ্তর খুলে ফেলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, ইরাক পুনর্গঠনে ঠিক কতো খরচ হবে তার কোনো ধারণা তাদের নেই। তবে ইউএনডিপির মতে, আগামী তিন বছর ১০০০ কোটি ডলার করে প্রয়োজন হতে পারে। তবে ওয়াল স্ট্রিটের অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, এই পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারও ছাড়িয়ে যেতে পারে। ইরাকের এই বিধ্বস্ত হাল আমেরিকার হাতেই হবে, সে কথা

ডলারের অপর পিঠ। 'ইন ফ্রড (প্রতারক) উই ট্রাস্ট' লেখায় মানবতাবাদীদের ক্ষোভ ফুটে উঠেছে। ১১ সেপ্টেম্বরকে ধরা হয়েছে 'ডলার যুদ্ধের' প্রতীক হিসেবে। ডলারের নাম দেয়া হয়েছে ডিসেপশন বা প্রতারণা

যুদ্ধাপরাধী বুশ-ব্লেয়ার

১৯৪৬ সালে নুরেমবার্গে বিচারকরা যুদ্ধাপরাধী নাৎসি নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ তুলেছিলেন। প্রথমত, জার্মানির প্রতি হুমকি না হওয়া সত্ত্বেও অন্য স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন। দ্বিতীয়ত, নির্বিচারে বেসামরিক নাগরিক হত্যা। যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তানো হয় 'ঊর্ধ্বতন' কর্তৃপক্ষের ওপর।

একই অভিযোগে বুশ এবং ব্লেয়ারের কি যুদ্ধাপরাধ আদালতে বিচার হওয়া উচিত নয়? স্বার্বভৌম দেশ ইরাকের বিরুদ্ধে বিনা কারণে আগ্রাসন এবং নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুকে নির্বিচারে হত্যার অপরাধে।

অবশ্য কারণ হিসেবে বুশ-ব্লেয়ার সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে একথা বলবেন। কিন্তু সাদ্দামকে এই অস্ত্র সরবরাহ করেছিলো কে? ইরানের ইসলামী বিপ্লব যেন

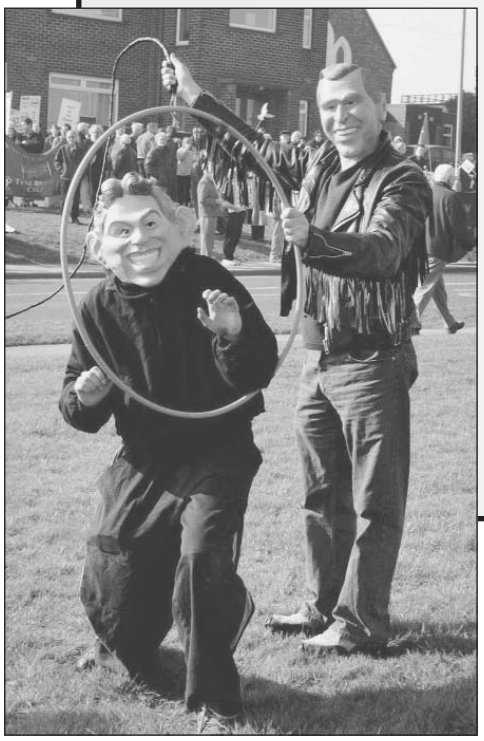

অবশ্য মার্কিন প্রশাসনের কেউই বলছেন না। যা বলছেন তা হলো, ইরাকের যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে নিজেদের পুনর্গঠনের কাজ এগিয়ে নেয়ার মতো। হোয়াইট হাউস মুখপাত্র আরি ফ্লেশার বলেছেন, ইরাক আফগানিস্তানের মতো দরিদ্র দেশ নয়। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পেন্টাগনের মতে, ইরাকের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে ব্যাপক সংস্কার আবশ্যক হবে। মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ আমেরিকান সেনাকে ইরাকে পাঁচ বছরের জন্য মোতায়েন প্রয়োজন হবে। এ জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৬৬০০ কোটি ডলার। এই টাকাও আসবে মূলত ইরাকি তেল বিক্রি করেই।

৭০ দশকে ইরাক থেকে বিতাড়িত হয়েছিলো ব্রিটিশ-মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো। এরপর তেলক্ষেত্রগুলো জাতীয়করণ করা হয়। এরপর থেকেই মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর নজর ইরাকি তেলের ওপর। ইউএসএইডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকের জন্য তারা যে নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে তাতে ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়া মানেই তেলশিল্পে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এক্সন- মোবিল, শেভরন-টেক্সাকোর মতো বৃহৎ মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো মধুর লোভে ভিড় জমিয়েছে ইতিমধ্যে। এদিকে ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলোও বসে নেই। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম শরিক ব্রিটেন। তাই ব্রিটেনও এই হরিলুটের ভাগ পাবে এটাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়নের মুখপাত্র রিচার্ড ওব্রিয়েন তাদের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছেন, ব্রিটেন যুদ্ধে রক্ত দেবে, কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্রিটেনের কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব কেন থাকবে না? অন্যদিকে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল জানিয়েছে, প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ ইরাকে তারা বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণে আগ্রহী। শোনা যায়, ডাউনিং স্ট্রিট এবং হোয়াইট হলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও হয়েছে ব্রিটিশ তেল-গ্যাস কোম্পানিটির। অন্যদিকে, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম (বিপি) জানিয়েছে, ইরাকে ব্যবসার যে কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করবে না। এতেই বোঝা যায়, যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি।

হোয়াইট হাউস থেকে ইরাকি তেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিষ্কার কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে অনেকে মনে করছেন, বড় বড় তেল কোম্পানিগুলোকে নিয়ে একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করা হবে যারা তেলের উত্তোলন ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ করবে। উত্তোলিত ইরাকি তেল ব্যবহৃত হবে বুশের কথামতো 'ইরাকের জনগণের কল্যাণে'।

টমাহক ক্রুজ মিসাইল : প্রতিটির মূল্য ৬ কোটি টাকা

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি না হতে পারে সে জন্য ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাককে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র সরবরাহ করেছিলো কে? সে তো আমেরিকা এবং ব্রিটেনই। এ কারণেই সাদ্দাম যখন ইরাকের সমস্ত অস্ত্রের তালিকা এবং উৎস জাতিসংঘে দাখিল করেন, আমেরিকা ১২০০০ পৃষ্ঠার সেই দলিল ছিনতাই করে। আমেরিকার বক্তব্য ছিলো এই দলিলে 'স্পর্শকাতর তথ্য' রয়েছে যা 'সামান্য সম্পাদনা' করতে হবে।

কি ছিলো সেইসব 'স্পর্শকাতর তথ্য'? ইরাকের সেই দলিলে ছিলো ১৫০ আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং অন্যান্য বিদেশী দেশের তালিকা যারা ইরাককে পারমাণবিক, রাসায়নিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি সরবরাহ করেছিলো যার অনেকগুলোই ছিলো অবৈধ।

নিরীহ মানুষ হত্যাকারী বুশ-ব্লেয়ার অবশ্যই যুদ্ধপরাধী

ইরাককে নিরস্ত্র করতে যুদ্ধ করেছে আমেরিকা ও ব্রিটেন। কিন্তু তাদের নিজেদের কি অবস্থা। ৬০ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে ৭০ টন বোমা ফেলেছিলো। হত্যা করেছিলো দশ লক্ষাধিক মানুষ।

এবারও ইরাকে বি-৫২ ব্যবহৃত হচ্ছে। '৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকে ৩ হাজার টন বোমা ফেলেছিলো। এবার কতো ফেলবে? আন্তর্জাতিক আইনে নিষিদ্ধ ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করছে ইরাকে। আফগানিস্তানেও ব্যবহার করেছে। এসব কি যুদ্ধাপরাধ নয়?

যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে 'এজেন্ট অরেঞ্জ' নামে রাসায়নিক বোমা ব্যবহার করেছিলো। ২০ দশকে ব্রিটেন ইরাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলো মাস্টার্ড গ্যাস। আর আজকে ইরাককে দোষী করা হচ্ছে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রাখার দায়ে। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের দক্ষিণে পারমাণবিক বর্জ্যে তৈরি ৩০০ বোমা নিক্ষেপ করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক গত ১২ বছর ধরে দক্ষিণাঞ্চল পারমাণবিক বর্জ্য পরিষ্কারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম চেয়ে আসছে। এসব বর্জ্যের কারণে রোগাক্রান্ত ইরাকি শিশুদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ চেয়ে আসছে। দেয়া হয়নি। এভাবেই যুদ্ধাপরাধের নজির সৃষ্টি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ঘোষণা দিয়েছেন, ইরাকে এমন হামলা হবে যার 'মাত্রা বিশ্ব এর আগে দেখেনি'। গত চার দিনে ইরাকে যতো ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের ৪০ দিনেও এতো হয়নি। এই হামলার নাম 'শক এন্ড অ'– আঘাত এবং ভীতি। এই বুদ্ধি যার মাথা থেকে বেরিয়েছে, সেই সমরবিশারদ হারলান উলমানের মতে, বাগদাদের কোথাও এক ইঞ্চি নিরাপদ জায়গা থাকবে না। এর প্রভাব হবে হিরোশিমার পারমাণবিক বোমার মতো। প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকে হামলার জন্য 'যথাযথ কারণ' খুঁজেছিলেন। পাননি। কিন্তু বুশ-ব্লেয়ারকে যুদ্ধাপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ বিশ্বাবসীর রয়েছে।

অন্তত আমরা বাইরে থেকে তাই দেখবো। কিন্তু ভেতরে চলবে তেলেসমাতি। পেন্টাগনের এক উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করে বলেছেন, তেলের টাকায় উঠে আসবে যুদ্ধ খরচ। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন থেকে ঘোষণা এসেছে, জাতিসংঘের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া তেল বিক্রির ৪০০০ কোটি ডলার তারা ইরাকি জনগণকে মানবিক সাহায্য হিসেবে দেয়ার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করবেন। ব্রিটেনও সমর্থন করেছে প্রস্তাবটি। মেরুদন্ড ভাঙা জাতিসংঘ রাজি হলেও যুদ্ধবাজেটের অর্ধেক খরচ উঠে আসবে অল্প দিনের মধ্যে।

বাগদাদে বসবে তাঁবেদার সরকার

তেল বিক্রি করে যুদ্ধ খরচ ওঠানোর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে বাগদাদে একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা। সেই ব্যবস্থা মোটামুটি পাকা করে ফেলেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। এমনও শোনা যাচ্ছে, কোনো মার্কিন জেনারেল কিংবা সাবেক স্টেট গভর্নর ইরাকে মার্কিন সামরিক সরকারের নেতৃত্বে থাকবেন। এই মার্কিন প্রশাসক ইরাকের জন্য নতুন সংবিধানসহ নতুন প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলবেন। এ সময় তাকে সহায়তা করবে সম্প্রতি ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নির্বাসিত ইরাকি নাগরিকরা। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই অনির্বাচিত মার্কিন সামরিক সরকার দু'বছর ইরাক শাসন করবে। মূলত এরাই ইরাকে দীর্ঘস্থায়ী ইঙ্গ-মার্কিন শোষণের ভিত রচনা করবে।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগে ব্রিটিশরা ঠিক এই কাজটিই করেছিলো। ১৯২০ সালে ব্রিটিশরা যখন ইরাক ছেড়ে চলে আসে তখন এক তাঁবেদার বাদশাহকে নিযুক্ত করা হয় ইরাকের শাসক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ব্রিটিশরা আবার ফিরে আসে ইরাকে। ইরাককে এ সময় জাতিগত বিন্যাস অনুযায়ী ভাগ করে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় ব্রিটিশরা ইরাকে বিমানঘাঁটি করে এবং ইরাকি তেলখনিগুলো নিজেদের কব্জায় নেয়। ৫৮ সাল পর্যন্ত ইরাকের তেল চুষে খায় ব্রিটিশরা। '৫৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে উৎখাত হয় ব্রিটিশ তাঁবেদার সরকার। খতম হয় ব্রিটিশ শোষণ।

যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ব্রিটিশরা যেমন করে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে ইরাকের তেলক্ষেত্রগুলো দখল করেছিলো, যুক্তরাষ্ট্রও সেটাই করতে চাইছে। যুক্তরাষ্ট্র এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানি ও জাপানের উদাহরণ টানছে। উল্লেখ্য, এ সময় জার্মানি ও জাপানে যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। জার্মানিকে 'মার্শাল প্ল্যানের' আওতায় ১.৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছিলো আমেরিকা। একই স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে ইরাকিদেরও। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, জার্মানি বা জাপানের তেল ছিলো না, যা ইরাকের আছে। ইরাক পুনর্গঠনের নামে এই তেলই বিক্রি করে নিজেদের আখের গোছাবে যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানের কথাই ধরা যাক। তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর সময় যুক্তরাষ্ট্র দেশটির জনগণকে পুনর্গঠনের কথা শুনিয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? কথা ছিলো আগামী ৫ বছরে আফগানিস্তানকে ৪৫০ কোটি ডলার সাহায্য দেয়া হবে। ২০০২ সালেই দেয়ার কথা ছিলো ১৮০ কোটি ডলার। কিন্তু বাস্তবে তার কানাকড়িও

আসেনি। তাই আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই আক্ষেপ করে বলেছেন, ইরাক যুদ্ধের পর তাদেরকে সাহায্য দেয়ার কথা যেন ভুলে না যাওয়া হয়। ইরাকে এ রকম হবে। সম্প্রতি ইউএনডিপি ১০ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। কেবলমাত্র জাপানই ১ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাকি সবাই নিশ্চুপ। ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের বৈঠক। সেখানে যুদ্ধপরবর্তী ইরাক পুনর্গঠনে সবাই একমত হলেও ফ্রান্স বলেছে, যারা যুদ্ধ করছে তাদেরই উচিত পুনর্গঠনের কাজ করা।

অন্যদিকে, ফ্রান্স ও রাশিয়া ঘোষণা দিয়েছে, সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে মার্কিন প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে কোনো সরকার তারা মেনে নেবে না। এখানেও কাজ করছে স্বার্থ। ইরাকের কাছে রাশিয়ার দেনা রয়েছে প্রায় ৫০০০ কোটি ডলার। এছাড়া দু'দেশের মধ্যে তেল ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তিও আছে। রাশিয়ার ভয়, ইরাকের মার্কিন নেতৃত্বাধীন শাসকগোষ্ঠী এসব চুক্তি বাতিল করতে পারে। এ ছাড়া ফ্রান্সের সঙ্গেও রয়েছে অনুরূপ চুক্তি। ইরাকের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবস্থাপনা ফ্রান্সের কারিগরি সহায়তাতেই

চলে। ফ্রান্স ও রাশিয়া স্পষ্ট বুঝতে পারছে, যুদ্ধপরবর্তী ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন লুটপাটে তারা সুবিধা করতে পারবে না। এ জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরাকে মার্কিন সরকারকে বৈধতা দেয়ার সকল প্রচেষ্টায় বাধা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশ দুটি।

যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘকে কতটুকু মূল্য দেয় তা বিশ্ববাসী জানে। যুদ্ধের পর যুদ্ধের খরচ তুলতে কারো বাধা যুক্তরাষ্ট্র গ্রাহ্য করবে এমন ভাবনা অমূলক। এই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ, তেলবিক্রি করেই তারা লাভ তুলবে।

সাদ্দাম উৎখাত বা সন্ত্রাস দমন যতো কথাই মুখে বলুক না কেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ, আসলে এই হত্যাকান্ড বিরাট বিনিয়োগ। আগামী দশ বছরের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ন্যূনতম আদায় করবে মার্কিন প্রশাসন এই যুদ্ধ থেকে। ইরাকের তেল বিক্রি করে এতো টাকা আদায় সম্ভব বলেই এতো মিসাইল নিক্ষেপ করা হচ্ছে। লাভের পরিমাণ অনেক বেশি বলেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী এতো ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়েছে। এই যুদ্ধ তাদের কাছে শুধু ব্যবসা।

বিভ্রান্তি
ছড়াচ্ছে পশ্চিমা মিডিয়া

ইরাক যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা মিডিয়া জোরেশোরে 'প্রচার যুদ্ধ' চালিয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী এসব মিডিয়ার প্রচারিত সংবাদ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নানা মহল থেকে। যুদ্ধের প্রথম দিনেই পশ্চিমা মিডিয়ার অভিসন্ধি টের পাওয়া যায়। ভোরের দিকে যুক্তরাষ্ট্রের আচমকা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সাদ্দাম নিহত হয়েছে এমন গুজব ছড়িয়ে দেয় সংবাদ মাধ্যমগুলো। কিন্তু ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ইরাকি টিভিতে ভাষণ দেন সাদ্দাম হোসেন। তিনি মার্কিন যুদ্ধ শুরুর প্রকৃত সময় উল্লেখ করেন তার ভাষণে। এরপর মিডিয়াগুলো সন্দেহ প্রকাশ করে, এটি আসল সাদ্দাম না কি নকল সাদ্দাম। ভাষণদানকারী ব্যক্তিটি সাদ্দামের ডামি– এমন প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিবিসি, সিএনএনের মতো নামকরা সংবাদ মাধ্যমগুলো তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের হাজির করে। প্রতিবারই জানানো হয় পেন্টাগন সূত্রের কথা। কিন্তু যুদ্ধের চতুর্থ দিন ব্রিটিশ গোয়েন্দা সূত্রের বরাদ দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জিওফ হুন জানান, সাদ্দাম এখনো বহাল তবিয়তে আছেন।

যুদ্ধের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রচার করে, ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় আল-ফাও উপদ্বীপ এবং বন্দর শহর উম্ম কসরের পতন ঘটেছে। এমনকি উম্ম কসরে মার্কিন পতাকাও উত্তোলন করা হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধের পঞ্চম দিনে এসেও পেন্টাগন স্বীকার করে উম্ম কসরে যুদ্ধ চলছে। একই প্রচার চালানো হয় বসরা, আন-নাসারিয়া এবং নাজাফ নিয়ে। যদিও ইরাকি সূত্রগুলো সর্বদাই এসব প্রচারকে অসত্য বলে আসছিলো। কিন্তু ইরাকের বক্তব্যকে পশ্চিমা মিডিয়া বরাবরই 'অনির্ভরযোগ্য' বলে উল্লেখ করে।

সবচে' মজার ব্যাপার ঘটে যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে। জোটবাহিনীর সৈন্য নিহত কিংবা বিমান ও ট্যাংক বিধ্বস্ত হবার খবর তারা গোপন করে গেছে। আল জাজিরা টিভিতে বন্দী মার্কিন সৈন্য এবং নিহতদের ছবি না দেখানো পর্যন্ত পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম এসব খবর প্রচার করেনি। যদিও বাগদাদসহ সর্বত্র তাদের সাংবাদিক রয়েছে। এমনকি রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধের তৃতীয় দিন বাগদাদের আকাশে গুলি করে বিমান ভূপাতিত করার ঘটনা এবং এক অথবা দুইজন পাইলটের প্যারাসুটের সাহায্যে বাগদাদে অবতরণের কথা একটি রাশিয়ান এবং কাতারের টিভি চ্যানেল প্রচার করলেও বিবিসি কিংবা সিএনএন এই খবর প্রচার করেনি। এই খবর তারা প্রচার করে পরদিন। এ ছাড়াও চতুর্থ দিন ইরাকি তথ্যমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন যেখানে তিনি মার্কিন মেরিন সেনার বন্দী হবার খবর দেন, বিবিসি তা সম্প্রচার করেনি।

যুদ্ধে ইরাকি বেসামরিক জনগণ নিহত হবার বিষয়টিও খুব সাদামাটাভাবে প্রচার করছে পশ্চিমা মিডিয়া। বরং জোট বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্রের নির্ভুলতা এবং ফিল্মি কায়দায় দু'তিনজন ইরাকি নাগরিকের আত্মসমর্পণের দৃশ্য গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার পায় পশ্চিমা মিডিয়ায়। এ ছাড়া বিবিসির সাংবাদিকদের ওপর নির্দেশ ছিলো ব্রিটিশ বাহিনীকে যেন 'আমাদের সেনাবাহিনী' না বলা হয়। কিন্তু বিবিসি টিভির দর্শকমাত্রই জানেন, খবর পাঠকরা অসংখ্যবার ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে 'আমাদের' বলে উল্লেখ করেছে। পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর যুদ্ধ কাভারেজ থেকে পরিষ্কার, আমেরিকা কিংবা ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর পক্ষ নিয়ে ইরাকি বাহিনীর মনোবল ধ্বংসের মিশন নিয়ে নেমেছে তারা।